بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, মোতাবেক ২তবলীগ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ্ পাঠ করেন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (সূরা আল্ মু'মিন: ১-৪)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (সূরা আল্ বাকারা: ২৫৬)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, আল্লাহ্ তা'লার নামে যিনি অশেষ দয়ালু, অযাচিত দানকারী, বার বার দয়াকারী। তিনি হামীদ এবং মাজীদ অর্থাৎ প্রশংসনীয় ও মর্যাদাশীল। এ কিতাবের অবতরণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি মহা পরাক্রমশালী ও পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং পরম দানশীল ও প্রাচুর্যের অধিকারী। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয় আয়াত হলো আয়াতুল কুরসী। এর অনুবাদ হলো, আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তাঁর দরবারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কে শাফায়াত করতে পারে? তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনিই জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না কেবল ততটা ব্যতীত যতটা তিনি চান। তাঁর রাজত্ব আকাশ এবং পৃথিবীময় বিস্তৃত। এই উভয়ের সুরক্ষা তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহা মর্যাদাবান ও মহামহিমান্বিত।

এই আয়াতগুলোর মাঝে বিসমিল্লাহ্ সহ প্রথম চারটি আয়াত সূরা মু'মিনের। আর অপর একটি আয়াত, আমি যেভাবে বলেছি, আয়াতুল কুরসী, যা সূরা বাকারার আয়াত।

এই আয়াতগুলোতে খোদা তা'লার কিছু গুণাবলী বা বেশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। হাদীসে এই আয়াতগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে সূরা মু'মিনের حم থেকে আরম্ভ করে إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত পাঠ করে, আর একইসাথে আয়াতুল কুরসীও পড়ে, তো এই উভয়ের মাধ্যমে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার হিফাযত বা সুরক্ষা

করা হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় এই উভয়টি পড়ে, সেক্ষেত্রে এর মাধ্যমে সকাল পর্যন্ত তার হিফাযত বা সুরক্ষা করা হবে। **(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবে ফাযায়েলুল কুরআন, হাদীস: ২৮৭৯)**

حم সূরা মু'মিনের দ্বিতীয় আয়াত। প্রথম আয়াত হলো بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। রহমান এবং রহীমের অর্থ অনুবাদের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপর রয়েছে حم যা **হুরুফে মুকাত্তাআত**-এর অন্তর্ভুক্ত। حم 'হামীদ' এবং 'মাজীদ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। হামীদ শব্দের অর্থ হলো সেই সত্তা যিনি প্রশংসার যোগ্য এবং সত্যিকার প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য বা তাঁরই জন্য সাজে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই প্রশংসার অধিকারী সত্তা।

'হাম্‌দ' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, হামদ সেই প্রশংসাকে বলা হয় যা প্রশংসাযোগ্য কোন ব্যক্তির ভালো কাজের জন্য করা হয়, সেই সাথে এমন পুরস্কারদাতার প্রশংসায় এ শব্দ ব্যবহার হয় যিনি সচেতনভাবে বা জেনেশুনে পুরস্কৃত করেছেন এবং নিজের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুগ্রহ করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "হামদ শব্দের বাস্তবতার নিরিখে প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য যিনি সকল জ্যোতি ও কল্যাণের উৎস এবং যিনি অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে (অর্থাৎ বুঝেশুনে স্বেচ্ছায়) কারো প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন, অজান্তে বা বাধ্য হয়ে নয়। প্রশংসা তারই করা হয় বা সত্যিকার প্রশংসা তারই প্রাপ্য যিনি কোন কারণে বা বাধ্য হয়ে অনুগ্রহ করেন না বরং অগণিত এহসান বা অনুগ্রহ করা অব্যাহত রাখেন। তিনি বলেন, **"প্রশংসার এই মর্মার্থ কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাতেই বিদ্যমান। তিনিই অনুগ্রহশীল এবং সূচনা ও সমাপ্তিতে সকল অনুগ্রহ তাঁরই পক্ষ থেকে হয়। এ পৃথিবীতেও এবং পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁরই। এছাড়া তিনি ব্যতীত অন্যদের জন্য কৃত সকল প্রশংসার প্রত্যাবর্তনস্থলও তিনিই।"** **(এজাযুল মসীহ্, পৃ: ৯৭, রাবওয়ার নাযারতে ইশায়াত কর্তৃক মুদ্রিত সংস্করণ)**

অর্থাৎ যদি খোদা ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করা হয় তাহলে অন্যদের প্রশংসাযোগ্য করে তোলার কারণে বা তাদেরকে প্রশংসনীয় কোন কাজ করার যোগ্যতা দানের সুবাদে তা-ও আল্লাহ্ তা'লারই কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে এমন কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন, যে কারণে তারা প্রশংসাযোগ্য হয়ে উঠেছে।

হাম্‌দ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন:

"কোন ক্ষমতাবান সত্তার ভালো কাজে তার মাহাত্ম্য ও সম্মান প্রকাশার্থে মৌখিকভাবে কৃত প্রশংসাকে হাম্‌দ বলা হয়। আর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা মহাপ্রতাপান্বিত খোদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বল্প হোক বা বেশি, সকল প্রকার প্রশংসার আধার হলেন আমাদের সেই প্রভু-প্রতিপালক যিনি পথভ্রষ্টদের হিদায়াত দানকারী ও হীনদের সম্মান দানকারী। আর তিনি প্রশংসিতদের দ্বারা প্রশংসিত। **(কারামাতুস সাদেকীন, পৃ: ১৩৩, রাবওয়ার নাযারতে ইশায়াত কর্তৃক মুদ্রিত সংস্করণ)**

অর্থাৎ সেসব সত্তা যারা নিজেরা প্রশংসাযোগ্য তারা সবাই তাঁর প্রশংসায় রত।

এই হামদ শব্দেরই ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন:

"হামদ শব্দে আরো একটি ইঙ্গিত রয়েছে, আর তা হলো, মহা কল্যাণের আধার আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, হে (আমার) বান্দাগণ! আমার গুণাবলীর মাধ্যমে আমাকে শনাক্ত কর আর আমার শ্রেষ্ঠত্বের আয়নায় আমাকে চেন। আমি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মত নই বরং আমি চরম অতিরঞ্জনের সাথে প্রশংসাকারীদের প্রশংসার চেয়েও অধিক প্রশংসার মর্যাদা রাখি। আর তোমরা ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে এমন কোন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য পাবে না, যা আমার সত্তায় বিদ্যমান নেই। আর আমার প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলীকে তোমরা যদি গণনা করতে চাও তাহলে তোমরা আদৌ তা গণনা করতে সক্ষম হবে না, তোমরা যতই প্রাণান্তকর চিন্তা কর না কেন এবং নিজ কাজে গভীরভাবে নিমগ্নদের মতো এ সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে যতই কষ্ট কর না কেন। খুব ভালোভাবে চিন্তা এবং প্রণিধান করে দেখ, এমন কোন প্রশংসা তোমাদের চোখে পড়ে কী যা আমার সত্তায় পাওয়া যায় না? এমন কোন শ্রেষ্ঠত্বের খবর পাও কী যা আমার কাছ থেকে বা আমার সন্নিধান থেকে দূরে? এমনটি মনে করে থাকলে তোমরা আমাকে মোটেই চিনতেই পার নি এবং তোমরা অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত।" (অতএব সকল প্রশংসা খোদা তা'লারই সাজে বা তাঁরই প্রাপ্য) তিনি বলেন, "বরং নিশ্চয় আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা) আমার প্রশংসনীয় গুণাবলী আর আমার শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে পরিচিত হই। আর আমার মুষলধারে বৃষ্টির কথা জানা যায় আমার কল্যাণরাজির মেঘমালার মাধ্যমে। অতএব যারা আমাকে সমস্ত উৎকর্ষ গুণাবলী এবং সকল শ্রেষ্ঠত্বের সমাহার হিসেবে বিশ্বাস করেছে, তারা যেখানে যে শ্রেষ্ঠত্বই দেখেছে এবং নিজেদের চিন্তাধারার পরম মার্গে উপনীত অবস্থায় যে জালাল বা প্রতাপই তাদের চোখে পড়েছে, সেটিকে তারা আমার সাথেই সম্পৃক্ত করেছে। আর সকল মাহাত্ম্য যা তাদের বিবেক-বুদ্ধি এবং দৃষ্টিতে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে এবং সকল কুদরত বা ক্ষমতা যা তারা চিন্তার জগতে খুঁজে পেয়েছে, সেটিকে তারা আমার প্রতিই আরোপ করেছে। অতএব এরা এমন মানুষ যারা আমার তত্ত্বজ্ঞানের পথে পরিচালিত হচ্ছে। সত্য তাদের সাথে রয়েছে আর তারাই সফলকাম হবে।"

তিনি বলেন, "অতএব আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে নিরাপদ রাখুন। ওঠো! মহাপ্রতাপান্বিত খোদার গুণাবলীর সন্ধানে রত হও। আর বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ এবং চিন্তা-প্রণিধানকারীদের মতো এক্ষেত্রে ভাব আর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখ।" (অর্থাৎ গভীর দৃষ্টি দাও। কেননা হামদ বা প্রশংসা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান-ব্যুৎপত্তি লাভ হলে তবেই অন্যান্য গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ হয় বা হতে পারে।) তিনি বলেন, "ভালোভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা কর আর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিটি দিকের ওপর গভীর দৃষ্টি দাও। আর এই বিশ্বজগতের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সবকিছুর মাঝে তাঁকে সেভাবে সন্ধান কর, যেভাবে লোভাতুর এক মানুষ গভীর আগ্রহের সাথে নিজের কামনাবাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় রত থাকে।" (অর্থাৎ খোদার কৃপারাজি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের জন্য, তাঁর প্রশংসার জন্য এবং তাঁর পথ সন্ধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কর এবং এক লোভী মানুষের ন্যায় চেষ্টা কর।) তিনি বলেন, "অতএব তোমরা যখন তাঁর পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব উদ্‌ঘাটন করবে আর তাঁর সৌরভ লাভ করবে, তখন তোমরা যেন তাঁকেই পেয়ে গেলে। আর এটি এমন একটি রহস্য যা কেবল হেদায়েত সন্ধানীদের সামনেই প্রকাশ পায়। অতএব ইনি

হলেন তোমাদের প্রভু প্রতিপালক এবং তোমাদের মনিব যিনি নিজে সম্পূর্ণ আর সকল উৎকর্ষ গুণাবলী ও প্রশংসাবলীর সম্যক সমাহার। **(কারামাতুস সাদেকীন, পৃঃ ১৩৫-১৩৭, রাবওয়ার নাযারতে ইশায়াত কর্তৃক মুদ্রিত সংস্করণ)**

সকল প্রশংসা, সকল গুণকীর্তন বা প্রশংসনীয় দিকগুলো তাঁরই সত্তায় সমবেত। অতএব খোদা তা'লার প্রশংসনীয় হওয়ার এই বোধ বা ব্যুৎপত্তি আমাদের অর্জন হওয়া উচিত, যাতে খোদা তা'লার অন্যান্য গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যাবলীকেও আমরা বুঝতে পারি।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তিনি মাজীদ অর্থাৎ তিনি সম্মানিত এবং বুযুর্গীর আধার। খোদার বুযূর্গ হওয়া সেই অর্থে নয় যেমনটি মানুষ সম্পর্কে আমরা বলে দেই যে, তিনি অত্যন্ত বুযূর্গ, কিংবা বয়োবৃদ্ধ লোকদের সম্পর্কেও মানুষ বলে থাকে যে, তিনি বুযূর্গ হয়ে গেছেন। বরং খোদার ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, তিনি পরম প্রশংসনীয় এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী যা অন্য কারো লাভ হতে পারে না। তাঁর কল্যাণরাজির কোন সীমা নেই। তিনি দান করেন এবং করতেই থাকেন, আর এ ক্ষেত্রে ক্লান্ত হন না। অতএব এই আয়াত পড়তে গিয়ে খোদার মাজীদ হওয়ার এই অর্থগুলো সামনে থাকতে হবে, অর্থাৎ প্রথমে হামদ বা প্রশংসা ও গুণকীর্তনের মর্ম এরপর তাঁর মাজীদ হওয়ার অর্থ।

পুনরায় বলেন, তিনি الْعَزِيزِ। অর্থাৎ তিনি সকল শক্তির আধার। সকল শক্তিধরের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তিনি অপরাজেয়। তাকে পরাজিত করা অসম্ভব। সকল সম্মান তাঁরই। তাঁর গুরুত্ব ও সম্মান অসীম বা অশেষ। তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর মতো আর কেউ হতেই পারে না। এ হলো আযীযের অর্থ।

এরপর বলা হয়েছে তিনি الْعَلِيمِ। অর্থাৎ তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, যা কিছু ঘটে গেছে তারও জ্ঞান রাখেন আর যা কিছু ভবিষ্যতে হবে তারও জ্ঞান রাখেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব ইনি হলেন সেই খোদা যিনি এই গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন এবং যিনি এই শেষ শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন। সকল যুগের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান তিনি এতে সরবরাহ করেছেন। আর এখন, সকল প্রকার নিরাপত্তা এবং বিজয় এর ওপর প্রকৃত অর্থে আমল করলেই অর্জন হবে এবং হতে পারে।

পুনরায় বলা হয়েছে, তিনি غَافِرِ الذَّنْبِ অর্থাৎ পাপ ক্ষমাকারী। অতএব তাঁর সামনে বিনত হয়ে পাপের ক্ষমা চাওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যে, স্বীয় পাপের জন্য সবসময় ক্ষমা চাইতে থাকা উচিত। একবার তিনি বলেন, মানুষ যে আলো লাভ করে তা সাময়িক হয়ে থাকে অর্থাৎ ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক যে আলোই লাভ হোক না কেন তা সাময়িক হয়ে থাকে। সেটিকে স্থায়ীভাবে নিজের সাথে রাখার জন্য ইস্তেগফারের প্রয়োজন হয়। তিনি বলেন, "নবীরা যে ইস্তেগফার করেন তারও কারণ হলো তারা এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকেন আর তাদের আশঙ্কা থাকে যে, আলোর যে চাদর আমরা প্রদত্ত হয়েছি কোথাও তা যেন ছিনিয়ে নেয়া না হয় বা প্রত্যাহার করা না হয়।" তিনি বলেন, "ইস্তেগফারের অর্থ এটিই হয়ে থাকে যে, বর্তমান জ্যোতি বা আলো যা খোদা থেকে লাভ হয়েছে তা যেন বলবৎ বা বিরাজমান থাকে

এবং আরো বর্ধিতাকারে লাভ হয়।" তিনি বলেন, "এটি অর্জনের জন্য" (অর্থাৎ তা লাভের জন্য) "পাঁচ বেলার নামাযও নির্ধারিত হয়েছে।" মাগফিরাত লাভের জন্য, সেই নূর বা জ্যোতি লাভের জন্য, নামাযও এরই অংশ কেননা নামাযে মানুষ পাপ থেকে তওবা করে, ক্ষমা চায়, আল্লাহ্ তা'লার মার্জনা যাচনা করে। তিনি বলেন, "যেন প্রতিদিনই সে প্রাণভরে খোদা তা'লার কাছ থেকে তা চেয়ে নেয়। যার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সে জানে যে, নামায হলো একটি মি'রাজ। আর নামাযের বিগলিত এবং আকুতি মিনতিপূর্ণ দোয়ার মাধ্যমেই এসব ব্যাধি থেকে সে মুক্তি পেতে পারে।"**(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪-১২৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)**

অর্থাৎ সকল প্রকার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির (সূরাহার) জন্য দোয়ার প্রয়োজন এবং দোয়ায় ইস্তেগফারের প্রয়োজন। আর নামাযও এ (প্রক্রিয়া)-রই অংশ। অতএব মহানবী (সা.) যে এই আয়াত পড়তে বলেছেন, স্মরণ রাখতে হবে, শুধু পাঠ করলে কিছু হবে না বরং ব্যবহারিক অবস্থারও উন্নয়ন আবশ্যক। নিজের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমরা কীভাবে ইস্তেগফার করব, কীভাবে আমরা নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করতে পারি, যেন এর ফলে আমরাও নিরাপদ থাকতে পারি।

ইস্তেগফারের ব্যাখ্যায় আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন: "ইস্তেগফারের অর্থ হলো আক্ষরিকভাবে কোন পাপ না হওয়া আর পাপকর্ম করার শক্তি প্রকাশ না পাওয়া।" অর্থাৎ যার ফলে পাপ হতে পারে সেই উপলক্ষ্যই যেন প্রকাশ না পায় এবং সেই শক্তিই যেন সৃষ্টি না হয়। তিনি বলেন, "নবীদের ইস্তেগফারেরও স্বরূপ এটিই। নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও ইস্তেগফার তারা এজন্য করেন যেন ভবিষ্যতে সেই অপশক্তি সামনে না আসে। আর সাধারণের ক্ষেত্রে ইস্তেগফারের আরো অর্থ হলো,"(অর্থাৎ এক সাধারণ ব্যক্তির জন্য ইস্তেগফারের অর্থ এটিও হবে যে,) "যেসব অপরাধ ও পাপ হয়ে গেছে তার কুফল থেকে যেন আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন এবং সেসব পাপ ক্ষমা করে দেন। আর একই সাথে ভবিষ্যতের পাপ থেকে যেন দূরে বা নিরাপদ রাখেন। যাহোক মানুষের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো সবসময় ইস্তেগফারে রত থাকা। এই যে দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এর অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকে, মানুষ যেন ইস্তেগফারে রত হয়ে যায়।"(অতএব মানুষ যখন বিপদে পতিত হয় অথবা আহমদীরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত এবং ইস্তেগফারের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।) তিনি বলেন, "কিন্তু ইস্তেগফারের অর্থ এটি নয় যে, কেবল 'আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলতে থাকবে। সত্যিকার অর্থে বিদেশী ভাষা হওয়ার কারণে এর প্রকৃত মর্ম মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। আরবরা তো এর মর্ম খুব ভালোভাবে বুঝতো কিন্তু যেহেতু এটি ভিনদেশী ভাষা তাই আমাদের দেশে বহু সত্য প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। অনেকেই এমন আছে যারা বলে যে, আমরা এত বার ইস্তেগফার করেছি, শত বার বা হাজার বার তসবীহ্ যপ করেছি, কিন্তু ইস্তেগফারের অর্থ এবং মর্ম জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে পারে না, অবাক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকে। মানুষের উচিত কার্যত বা প্রকৃত অর্থেই ভেতরে ভেতরে বা মনে মনে সদা ক্ষমা চাইতে থাকা অর্থাৎ সেই পাপ এবং অপরাধ যা আমার দ্বারা সাধিত হয়েছে, তার শাস্তি যেন পেতে না হয়। আর নিজেরই মন ও মননে ভবিষ্যতে

খোদার কাছে এই সাহায্য যাচনা করা যে, তিনি যেন ভবিষ্যতে নেক কর্মের তৌফিক দেন আর পাপকর্ম থেকে রক্ষা করেন।" তিনি বলেন, "ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, কেবল কথায় কোন কাজ হবে না। আল্লাহ্‌তা'লা পূর্বের পাপ ক্ষমা করুন এবং ভবিষ্যতের পাপ থেকে মুক্ত রাখুন আর নেককর্ম করার তৌফিক দিন- এই মর্মে নিজের ভাষায়ও ইস্তেগফার করা যায়, এটিই প্রকৃত ইস্তেগফার। এমনিতেই 'আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলতে থাকবে আর হৃদয়ে এর কোন প্রভাবই পড়বে না, এর কোন প্রয়োজন নেই।" (ইস্তেগফারের ফলে যদি হৃদয়েও সেই নম্রতা, বিগলন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি না হয় এবং খোদাভীতি তথা আল্লাহ্ তা'লার ভয় না জাগে, তাহলে এর কোন লাভ নেই। হৃদয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া উচিত।) তিনি বলেন, "স্মরণ রেখো! খোদার দরবারে সেই কথাই পৌঁছে, যা মন থেকে উদ্ভূত হয়। নিজ ভাষাতেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক দোয়া করা উচিত। এর ফলে হৃদয়ের ওপরও প্রভাব পড়ে। মুখ তো কেবল হৃদয়ের সাক্ষ্য দেয়। হৃদয়ে যদি উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় আর মুখও যদি এর সঙ্গ দেয় তাহলে ভালো কথা। আন্তরিকতাশূন্য মৌখিক দোয়া অর্থহীন।" (অর্থাৎ বৃথা।) "হ্যাঁ আন্তরিক দোয়াই আসল দোয়া হয়ে থাকে। বিপদাপদ আপতিত হওয়ার পূর্বেই মানুষ যদি মনে মনে বা আন্তরিকভাবে খোদার কাছে দোয়া করতে থাকে এবং ইস্তেগফারে রত থাকে তাহলে দয়াবান ও কৃপাময় খোদার বদান্যতায় সেই বিপদ টলে যায়।" (এটি নয় যে, সমস্যা বা বিপদাপদ ও কাঠিন্য এবং কষ্টে নিপতিত হলে দোয়া করবে। তার পূর্বেই দোয়ায় রত থাকা উচিত। এর ফলে দয়ালু ও কৃপালু খোদা সেই বিপদাপদ টলিয়ে দেন।) "কিন্তু বিপদ যখন এসে যায় তখন তা আর টলে না। বিপদাপদ পতিত হওয়ার পূর্বেই দোয়ায় রত থাকা উচিত এবং অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিপদের সময় নিরাপদে রাখেন।" তিনি বলেন, "আমাদের জামা'তের উচিত স্বতন্ত্র কোন বিশেষত্ব প্রকাশ করা।" (কোন পার্থক্য থাকা উচিত।) "যদি কোন ব্যক্তি বয়আত করে যায় কিন্তু কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না করে, নিজের স্ত্রীর সাথে পূর্বের মতই ব্যবহার করে, আর নিজ পরিবার পরিজন ও সন্তানদের সাথে পূর্বের মতই আচরণ করে, তাহলে এটি ভালো কথা নয়। বয়আতের পরও যদি সেই দুর্ব্যবহার এবং দুরাচারিতাই প্রকাশ পায় আর অবস্থা যদি তা-ই থাকে যা পূর্বে ছিল, তাহলে বয়আত করে লাভ কী? বয়আতের পর অ-আহমদীদের আর আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সাথেও এমন আদর্শ দেখানো উচিত যেন তারা বলতে বাধ্য হয় যে, এখন সে আর তা নয় যা পূর্বে ছিল।" তিনি বলেন,"ভালোভাবে স্মরণ রেখো, নির্মলতার সাথে আমল করলে অন্যদের ওপর অবশ্যই তোমাদের প্রভাব পড়বে। মহানবী (সা.) এর কত বড় প্রভাব ও প্রতাপ ছিল! একবার কাফিরদের আশঙ্কা হয় যে, মহানবী (সা.) অভিশাপ দেবেন বা অভিসম্পাত করবেন। তখন সকল কাফির সম্মিলিতভাবে আসে এবং নিবেদন করে যে, হুযূর! অভিশাপ দেবেন না। সত্যবাদী মানুষের প্রভাব এবং প্রতাপ অবশ্যই পড়ে থাকে। তাই সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছতার সাথে আমল করা উচিত আর আল্লাহ্‌র খাতিরে তা করা উচিত, তাহলে অবশ্যই অন্যদের ওপর তোমাদের প্রতাপ ও প্রভাব পড়বে।" **(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭২-৩৭৪, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)**

অতএব ইস্তেগফার করা এবং এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব সৃষ্টি করা উচিত। 'যিকর আযকার' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ আর দোয়া তখন কাজে আসে যখন একই সাথে কর্মের মানেরও উন্নয়নের প্রচেষ্টা থাকে। মানুষ বলে যে, কোন ছোট দোয়া বলে দিন যেন আমরা তা পড়তে পারি। ছোট দোয়াও তখনই কাজে আসে যখন ফরয বা আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলী পালন করা হয়। নামায পড়ুন। নামায যদি সময়মত পড়া হয়, রীতিমত এবং সাগ্রহে পড়া হয় কেবল তবেই 'যিকর আযকার' কাজে দিবে।

এরপর এখানে আল্লাহ তা'লার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে , তিনি قَابِلِ التَّوْبِ অর্থাৎ তওবা গ্রহণকারী। 'তওবা' শব্দের অর্থ হলো নিজ পাপের ক্ষমা যাচনা করে খোদার দিকে ফিরে আসা। অতএব মানুষ যদি এই অঙ্গীকারের সাথে খোদার দরবারে উপস্থিত হয় যে, আমি ভবিষ্যতে আর কোন পাপ করব না, আর সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এই প্রেরণা ও সংকল্প নিয়ে যারা তাঁর দিকে ফিরে আসে তাদের তওবা গ্রহণ করেন।

এই বিষয়টিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "সেই দিন কোনটি যা জুমুআ এবং দুই ঈদের চেয়েও শ্রেয় এবং কল্যাণময় দিন? আমি তোমাদের বলছি যে, সেই দিনটি হলো মানুষের তওবা করার দিন, যা অন্য সব দিনের চেয়ে উত্তম এবং সকল ঈদের চেয়ে বড়। কেন? কেননা সেদিন পাপের সেই ফিরিস্তি যা মানুষকে জাহান্নামের নিকটতর করতে থাকে আর ভেতরে ভেতরে তাকে ঐশী ক্রোধের লক্ষ্যে পরিণত করছিল, তা বিধৌত করা হয় এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। সত্যিকার অর্থে মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় খুশি এবং ঈদের দিন আর কোনটি হবে যা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম এবং চিরস্থায়ী ঐশী ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি দিবে। তওবাকারী গুনাহ্গার, যে পূর্বে খোদা থেকে দূরে ছিল এবং তাঁর ক্রোধের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছিল, তাঁর কৃপায় এখন সে তাঁর নিকটতর হয় আর জাহান্নাম এবং শাস্তি থেকে তাকে দূরবর্তী করা হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (সূরা বাকারা: ২২৩) অর্থাৎ নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা তওবাকারীদের ভালবাসেন, আর যারা পবিত্রতার সন্ধানী তাদেরকেও ভালোবাসেন। এই আয়াত থেকে শুধু এটিই জানা যায় না যে, আল্লাহ্ তা'লা তওবাকারীদের তাঁর প্রেমাস্পদের মর্যাদা দেন, বরং এটিও বোঝা যায় যে, সত্যিকার তওবার শর্ত হলো সত্যিকার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা।" (সত্যিকার তওবা সেটিই যার সাথে প্রকৃত পবিত্রতা থাকে। মানুষ যেন এই দৃঢ় সংকল্প করে যে, ভবিষ্যতে আমি কোন পাপ করব না। অতএব এটি যখন হবে অর্থাৎ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যদি থাকে তাহলেই তওবা গৃহীত হবে।) তিনি বলেন, "সকল প্রকার নোংরামি এবং আবর্জনা থেকে পৃথক হওয়া আবশ্যকীয় শর্ত। নতুবা কেবল তওবা এবং শব্দের পুনরাবৃত্তিতে কোন লাভ নেই। অতএব যেই দিন এতটা কল্যাণময় যে, মানুষ তার অপকর্ম থেকে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার মিমাংসার অঙ্গীকার করে এবং তাঁর নির্দেশ মানতে গিয়ে নিজের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, তাহলে এতে কী কোন সন্দেহ আছে যে, তাকে সেই শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে, যা চুপিসারে বা তার অজান্তে তার অপকর্মের ফলশ্রুতিতে তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর এভাবে সে সেই জিনিস লাভ করে যা সম্পর্কে তার কোন প্রত্যাশা বা আশাই ছিল না।"

তিনি বলেন, "তোমরা নিজেরাই ধারণা করতে পার যে, এক ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার বিষয়ে যখন সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যায় আর সেই নৈরাশ্য এবং হতাশার মাঝেই যদি তার লক্ষ্য অর্জিত হয় তাহলে সে কতই না আনন্দিত হবে! তার হৃদয় এক নতুন জীবন লাভ করবে। এ কারণেই হাদীসে এর উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস এবং অতীতের ধর্মগ্রন্থ থেকে এটিই জানা যায় যে, মানুষ যখন পাপের মৃত্যু থেকে বেরিয়ে তওবার মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তার এই জীবনে সন্তুষ্ট হন। এটি সত্যিকার অর্থেই আনন্দের বিষয় যে, মানুষ যখন পাপের বোঝায় জর্জরিত আর চতুর্দিক থেকে ধ্বংস ও মৃত্যুর নাগালের ভেতর থাকে এবং ঐশী শাস্তি তাকে গ্রাস করার জন্য প্রস্তুত, এমতাবস্থায় নিমিষেই সেই পাপ এবং অপকর্ম, যা দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে চলছিল, তা থেকে তওবা করে সে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সেটি খোদার জন্য আনন্দের সময় হয়ে থাকে এবং ঊর্ধ্বলোকে ফিরিশতারাও আনন্দিত হয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, তাঁর কোন বান্দা ধ্বংস হোক। বরং তিনি চান যে, তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে যদি কোন দুর্বলতা এবং ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়ে যায় তারপরও সে যেন তওবা করে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে প্রবেশ করে। অতএব স্মরণ রেখ! যেদিন মানুষ নিজের পাপ থেকে তওবা করে সেটি বড়ই কল্যাণময় দিন এবং অন্য সব দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন, কেননা সেদিন সে নতুন জীবন লাভ করে আর তাকে খোদার নিকটতর করা হয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিনটি (অর্থাৎ বয়আতের দিন, যেদিন তোমাদের মাঝে অনেকেই অঙ্গীকার করেছ যে, আজ আমি নিজের সকল পাপ থেকে তওবা করছি আর ভবিষ্যতে যথাসাধ্য পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে চলব) এটিই ইয়াওমে তওবা বা তওবার দিন। আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আন্তরিকতা বা সততার সাথে তওবা করেছে, তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আর এভাবে সে **'আততায়েবু মিনায যানবে কামান লা যানবা লাহু'**-র অধীনে এসে গেছে। অর্থাৎ বলা যায়, সে যেন কোন পাপ করে-ই নি। তবে হ্যাঁ আমি আবার বলছি যে, এর জন্য শর্ত হলো প্রকৃত পবিত্রতা ও সত্যিকার পরিচ্ছন্নতার দিকে পদচারণা করা। আর এই তওবা যেন কেবল বুলিসর্বস্ব না হয় বরং কর্ম-গুণে যেন সজ্জিত হয়। কারো পাপ ক্ষমা করে দেয়া, সামান্য কোন কথা নয় বরং অনেক বড় বিষয়।"

তিনি বলেন, "দেখ! কোন মানুষ যদি কারো বিরুদ্ধে সামান্য কোন অপরাধ করে বা কোন ভুল-ভ্রান্তি করে বসে তাহলে অনেক সময় বংশপরম্পরায় শত্রুতা চলতে থাকে। বংশপরম্পরায় সে প্রতিপক্ষের সন্ধানে থাকে যেন সুযোগমত প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু। তিনি মানুষের মতো কঠোর হৃদয়ের অধিকারী নন, যে এক পাপের জন্য বংশপরম্পরায় পিছু ধাওয়া পরিত্যাগ করে না এবং ধ্বংস করতে চায়। পক্ষান্তরে সেই দয়ালু ও কৃপালু খোদা সত্তর বছরের পাপকে একটি মাত্র কথায় এক মুহূর্তে ক্ষমা করে দেন। এ কথা মনে করো না যে, এ ক্ষমা এমন বিষয় যাতে কোন লাভ নেই, না! সেই ক্ষমা প্রকৃতই কল্যাণকর এবং উপকারী। তারাই এটি ভালোভাবে বুঝে এবং অনুধাবন করে, যারা আন্তরিকভাবে তওবা করেছে।"
(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৪৮-১৫০, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)

অতএব সত্যিকার তওবাই এই নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। যদি এটি না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, স্মরণ রেখো, তিনি شَدِيدِ الْعِقَابِ ও বটে। অর্থাৎ মানুষ যখন খোদার নির্দেশের কোন পরোয়া করে না তখন খোদা তাকে শাস্তিও দেন।

এরপর বলেন, তিনি ذِي الطَّوْلِ অর্থাৎ মহা দানশীল। তিনি মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর দানের কোন সীমা নেই, কেননা তিনি শক্তির আধার। তিনি সবকিছু দিতে পারেন কেননা তাঁর ভাণ্ডার অফুরান বা অসীম। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা স্মরণ রেখো, তাহলে সবসময় কল্যাণমণ্ডিত হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারো এত ক্ষমতা বা শক্তি নেই। আর আমরা এ পৃথিবীতেও আর মৃত্যুর পরও তাঁর দিকেই ফিরে যাব। অতএব এই চেতনাবোধ যদি জাগ্রত থাকে যে, অবশেষে খোদার দিকেই ফিরে যেতে হবে তাহলে নেক কাজ করার এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপনের প্রতি মনোযোগ থাকবে। এরূপ অবস্থা হলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই সুরক্ষা করে থাকেন।

এরপর দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ আয়াতুল কুরসীর প্রতি একবার মহানবী (সা.) এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সবকিছুরই এক শিখর বা চূড়া থাকে। আর পবিত্র কুরআনের শিখর বা চূড়া হলো সূরা বাকারা। আর তাতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনের সব আয়াতের সর্দার এবং সেটি হলো আয়াতুল কুরসী। **(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবে ফাযায়েলুল কুরআন, হাদীস: ২৮৭৮)**

এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ। অর্থাৎ তিনিই খোদা, তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই। তিনিই সকল প্রাণের উৎস এবং সকল অস্তিত্বের অবলম্বন। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো, সেই খোদাই জীবন্ত এবং সেই খোদাই নিজ অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত। অতএব যেখানে একমাত্র তিনিই জীবিত এবং তিনিই নিজ অস্তিত্বে বিদ্যমান সত্তা, অতএব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি ছাড়া যাদেরকে জীবিত দেখা যায় তাদের সকলেই তাঁর মাধ্যমে জীবনপ্রাপ্ত। আর আকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই প্রতিষ্ঠিত, তারা তাঁর পবিত্র সত্তার গুণেই প্রতিষ্ঠিত।" **(চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩শ খণ্ড, পৃ: ১২০)**

এরপর এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "জেনে রাখা উচিত, কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'লার দু'টো নাম উপস্থাপন করেছে। একটি হলো الْحَيُّ। অপরটি হলো الْقَيُّومُ। الْحَيُّ। শব্দের অর্থ হলো নিজে জীবন্ত এবং অন্যদের জীবন দানকারী। الْقَيُّومُ। শব্দের অর্থ হলো নিজ গুণে প্রতিষ্ঠিত আর অন্যদের স্থায়িত্বের প্রকৃত কারণ। প্রত্যেক বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ স্থিতি-স্থিরতা এবং জীবন এই দুই গুণের কাছে ঋণী। অতএব الْحَيُّ। শব্দের দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা।" (এটি প্রণিধানযোগ্য কথা।) الْحَيُّ। শব্দের দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা। যেমনটি সূরা ফাতিহার إِيَّاكَ نَعْبُدُ তে এর বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। আর الْقَيُّومُ। এর দাবি হলো তাঁর অবলম্বন যাচনা করা এবং إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে।" (যদি জীবিত থাকতে হয় আর আধ্যাত্মিকভাবেও জীবিত থাকতে হয় এবং الْحَيُّ। বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে হয় তাহলে তাঁর

ইবাদত করা আবশ্যক। আর ইবাদতের সামর্থ্য লাভের জন্য তাঁর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তৌফিক দিন যেন আমরা ইবাদতকারী হই।) اَلْحَيُّ। ইবাদতের দাবি রাখেন কেননা তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করে পরিত্যাগ করেন নি বা নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেন নি। যেমন কোন মিস্ত্রি, যে ঘর বানায়, সে মারা গেলেও সেই বিল্ডিংয়ের বা ঘরের কোন ক্ষতি নেই।" (অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে কোন ঘর বা বিল্ডিং নির্মাণ করেছে, সে মারা গেলেও সেই বিল্ডিংয়ের কিছু যায় আসে না।) "কিন্তু মানুষের সর্বদা খোদার প্রয়োজন থাকে।" (অর্থাৎ মানুষ সর্বাবস্থায় খোদার মুখাপেক্ষী।) "তাই খোদার কাছে শক্তি যাচনা করতে থাকা আবশ্যক আর এটিই ইস্তেগফার।" **(মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)**

ইস্তেগফার সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা পূর্বে বিশদভাবে হয়ে গেছে যে, ঐশী কল্যাণরাজির জ্যোতি বা আলোকে স্থায়ীভাবে প্রবহমান রাখার জন্য ইস্তেগফারের প্রয়োজন আর এই ইস্তেগফারই হলো ইবাদত এবং এর ফলে শক্তি লাভ হয়।

পুনরায় আয়াতুল কুরসীতে শাফায়াতের যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যখন অন্যের জন্য দোয়া করে তা-ও এক প্রকার শাফায়াত বা সুপারিশ। আর এটি এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত যা সে সবসময় করতে থাকবে।

তিনি (আ.) বলেন: "আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা অনুমতি ব্যতীত কোন শাফায়াত হতে পারে না।" (আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন,) "কুরআন শরীফ অনুসারে শাফায়াতের অর্থ হলো, এক ব্যক্তির নিজ ভাইয়ের জন্য দোয়া করা যে, তার যেন সেই লক্ষ্য অর্জন হয় বা কোন বিপদাপদ যেন টলে যায়।" (অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কেউ দোয়ার অনুরোধ করেছে, দোয়া করা উচিত যেন তার সেই উদ্দেশ্য অর্জন হয়। কোন বিপদাপদ থাকলে সেই বিপদাপদ যেন টলে যায়।) তিনি বলেন, "অতএব পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো, যে ব্যক্তি খোদার দরবারে অধিক বিনত, সে যেন নিজের দুর্বল ভাইয়ের জন্য দোয়া করে যে, তারও যেন সেই মর্যাদা লাভ হয়। এটিই শাফায়াত বা সুপারিশের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্ম। সুতরাং আমরা আমাদের ভাইদের জন্য দোয়া করি যে, খোদা যেন তাদের শক্তি ও সামর্থ্য দেন এবং তাদের বিপদ যেন দূর করেন; আর এটি এক প্রকার সহমর্মিতা।" **(নাসীমে দা'ওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩)**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "যেহেতু সব মানুষ এক দেহতুল্য তাই আল্লাহ্ তা'লা বার বার আমাদের শিখিয়েছেন যে, যদিও শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহন করা তাঁর কাজ, কিন্তু তোমরা নিজ ভাইদের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশে অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়ায় রত থাক। আর শাফায়াত থেকে অর্থাৎ সহমর্মিতাপূর্ণ দোয়া থেকে বিরত থাকবে না, কেননা তোমাদের পরস্পরের কাছে এটি পরস্পরের প্রাপ্য।" (অর্থাৎ একে অপরের জন্য দোয়া করতে থাকা পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার।) 'শাফায়াত' শব্দটি আসলে 'শুফআ' থেকে নেয়া হয়েছে। 'শুফআ' বলা হয় জোড়কে যা বেজোড়ের বিপরীত। অতএব মানুষকে তখন শফী বলা হয় যখন সে পরম সহানুভূতির সাথে অন্যের জোড়া হয়ে তার মাঝে বিলীন হয়ে যায়। আর অন্যের জন্যও সেভাবেই নিরাপত্তা যাচনা করে যেভাবে নিজের জন্য করে। সেই সাথে স্মরণ রাখা উচিত, কোন ব্যক্তির ধর্ম ততক্ষণ সম্পূর্ণ হতে পারে না

যতক্ষণ পর্যন্ত শাফায়াতরূপী সহানুভূতি তার মাঝে সৃষ্টি না হবে।" (অর্থাৎ পরস্পরের জন্য পরম সহানুভূতি থাকা উচিত।) তিনি বলেন, "বরং ধর্মের দু'টোই পরিপূর্ণ দিক রয়েছে, একটি হলো আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসা, অপরটি হলো মানবজাতিকে এতটা ভালোবাসা যে, তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা, যেটিকে অন্য ভাষায় শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়।" **(নাসীমে দা'ওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪)**

এটি একটি গূঢ় রহস্য, যা আয়াতুল কুরসী পড়ার সময় আমরা সামনে রাখলে মানব জাতির জন্য আমাদের সহানুভূতির প্রেরণা ও চেতনা বৃদ্ধি পাবে।

মহানবী (সা.) যেহেতু আমাদেরকে এটি পড়ার নসীহত করেছেন, তাই এতে ঈমান আনয়নকারীদের পারস্পরিক সহানুভূতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার বিশেষভাবে নির্দেশ রয়েছে। আর মানবজাতির জন্য সামগ্রিকভাবে এই শিক্ষা রয়েছে যে, তোমাদের হৃদয়ে সবার জন্য সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ মুসলমানরা নিজেরাই একে অপরের রক্তপিপাসু, অথচ তাদের দাবি হলো, আমরা কুরআন এবং হাদীস মেনে চলি! যাহোক এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃত শাফায়াতের অধিকার আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে দিয়েছেন আর এর প্রতিফলন তাঁর (সা.) জীবদ্দশায় আমরা দেখেছি। যেমন সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"পরকালের 'শফী' সে-ই প্রমাণিত হতে পারে যে, এই পৃথিবীতে শাফায়াতের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।" [পরকালেও তিনিই শফী বা সুপারিশকারী হবেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি শাফায়াত করবেন। আর সে-ই সুপারিশকারী প্রমাণিত হতে পারে যে পৃথিবীতে শাফায়াতের কোন দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।] "অতএব এই মানকে সামনে রেখে মূসা (আ.) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে, তিনিও শফী বা শাফায়াতকারী প্রমাণিত হন কেননা বার বার দোয়ার মাধ্যমে তিনি বর্ষণোন্মুখ শাস্তি টলিয়ে দিয়েছেন। আর তৌরাত এর সাক্ষী। একইভাবে আমরা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন তার শফী বা শাফায়াতকারী হওয়া সবচেয়ে সুস্পষ্ট সত্য প্রমাণিত হয়।" (অর্থাৎ অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট এবং উজ্জ্বলভাবে চোখে পড়ে।) "কেননা তাঁর শাফায়াতের কল্যাণেই দরিদ্র সাহাবীদেরকে তিনি সিংহাসনে বসিয়েছেন। আর তাঁর শাফায়াতের প্রভাবেই মূর্তিপূজা এবং শিরকের মাঝে যারা লালিতপালিত হয়েছে তারা এমনভাবে একত্ববাদী হয়ে গেছে যার দৃষ্টান্ত কোন যুগে দেখা যায় না। আর তাঁর শাফায়াত বা সুপারিশেরই সুফল এটি যে, আজ পর্যন্ত তাঁর (সা.) অনুসারীরা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সত্যিকার ইলহাম লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তাদের সাথে বাক্যালাপ করেন। কিন্তু ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে এসব প্রমাণ কোত্থেকে এবং কীভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে? আমাদের নেতা এবং মনিব মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর শাফায়াত বা সুপারিশের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় এবং অসাধারণ প্রমাণ আর কী হবে যে, আমরা এই রসূলের কল্যাণে খোদা থেকে যা কিছু লাভ করি আমাদের শত্রুদের জন্য তা পাওয়া সম্ভব নয়। যদি আমাদের বিরোধীরা এটি পরীক্ষা করে দেখতে চায় তাহলে কয়েকদিনের ভেতরেই সিদ্ধান্ত হতে পারে।" **(ইসমতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯৯-৭০০)**

এরপর আয়াতুল কুরসীর শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক দু'টো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো, الْعَلِيُّ। অর্থাৎ মহান মর্যাদার অধিকারী, যার চেয়ে বড় মর্যাদা আর কারো নেই। তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং তিনি সুমহান। তাঁর মাহাত্ম্য, গরিমা এবং মহান মর্যাদা এমন, যে পর্যায়ে অন্য কেউ পৌঁছতে পারে না। তাঁর মহান মর্যাদা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। কোন কিছু তাঁর বেষ্টনী বা গণ্ডির বাইরে নয়। الْعَلِيُّ। হওয়া, তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা। আর তাঁর الْعَظِيمُ। হওয়ার অর্থ হলো, তাঁর মাহাত্ম্য, গরিমা এবং মহান মর্যাদা এমন পর্যায়ে যেখানে কেউই পৌঁছতে পারে না। এটি হলো الْعَظِيمُ। হওয়ার অর্থ। এর আরেকটি অর্থ হলো, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। কোন কিছু তাঁর গণ্ডি এবং বেষ্টনীর বাইরে নয়। এটি হলো তাঁর সুমহান এবং সুউচ্চ হওয়া।

এই আয়াতের শেষ অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "আল্লাহ্ তা'লার কুরসী বা শাসন ক্ষমতা সংক্রান্ত আয়াত হলো وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ অর্থাৎ খোদা তা'লার শাসনগণ্ডিতে রয়েছে সকল ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল। আর তিনি এর সবকিছু বহন করছেন। তা বহনে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি অতি উচ্চ। কেউ তাঁর গভীরতায় পৌঁছতে পারে না। তিনি সবচেয়ে বড়। তাঁর মাহাত্ম্যের সামনে সবকিছু তুচ্ছ। এটি হলো কুরসী বা আসন অর্থাৎ শাসনক্ষমতার অর্থ। আর এটি কেবল একটি রূপক বিষয় যার মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার নিয়ন্ত্রণাধীন। আর এ সবকিছুর মর্যাদা থেকে তাঁর মর্যাদা মহান ও বড় এবং তাঁর মাহাত্ম্যের কোন সীমা নেই।" **(চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ১১৮, টীকা)**

অতএব ইনি হলেন সেই মহান খোদা যার মাহাত্ম্যের কোন কিনারা নেই এবং যার গণ্ডি হলো অসীম। তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁর কোন সীমা নেই। সবকিছু তাঁর আয়ত্তের মাঝে রয়েছে। প্রতিটি বস্তুকে তিনি আয়ত্ত করে রেখেছেন। অতএব মানুষ যদি এসব কথা অনুধাবন করে আর এটি বুঝে যদি কুরআনের আয়াত পড়ে, কেবল তবেই খোদার স্নেহক্রোড়ে স্থান পেতে পারে এবং তাঁর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান লাভ করতে পারে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করে তখন সে খোদার প্রাপ্য এবং বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানেরও চেষ্টা করে এবং করা উচিত। আর এসব প্রাপ্য অধিকার যদি প্রদান করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও হিফাযত বা নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

অতএব এই বিষয়টিকে আমাদের নিজেদের সামনে রাখতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে এই আয়াত পড়বে সে আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, আয়াত কেবল পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং এর বিষয়বস্তুতে প্রণিধান করে সেসব পথ অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেসব জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জনেরও আবশ্যকতা রয়েছে যা এসব আয়াত সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন। পবিত্র কুরআন বেশ কয়েক জায়গায় এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কারভাবে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যদি এই

বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকে তাহলে মানুষ খোদা তা'লার কৃপায় তাঁর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আজও আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যা প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের স্ত্রী আবেদা বেগম সাহেবার। তিনি নওয়াবশাহ্‌র অধিবাসীনী ছিলেন। গত ২২ জানুয়ারি ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতার নাম ছিল নিয়াজ মুহাম্মদ খান। তিনি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে করাচীতে চীফ কমিশনার ছিলেন, তবে তিনি আহমদী ছিলেন না। আবেদা বেগম সাহেবার মা আহমদী ছিলেন। তার সন্তান-সন্ততির মাঝে কেবল আবেদা বেগমই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৩ সনে বয়আত করেছিলেন, আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যতও করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার পড়াশোনা শেষ করার পর অর্থাৎ বি.এ. পাস করার পর প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের সাথে তার বিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র দান করেছেন। তিনি নওয়াবশাহ্ শহরের লাজনা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন নওয়াবশাহ্ জেলারও লাজনা প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং অনেক খিদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে মিটিংয়ের ব্যবস্থার সময় লাজনাদের সাথে খুব ভালো যোগাযোগ বহাল রাখেন। জেলার দূর দুরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করতেন। সম্পদশালী পরিবারের সদস্যা হওয়া সত্ত্বেও খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দরিদ্র এবং দুর্বলদের সাহায্য করতেন আর দুর্বল আহমদীদের ঘরে অবশ্যই যেতেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল তার। তবলীগ করে তিনি নওয়াবশাহ্‌র প্রায় সতের জন মহিলাকে বয়আত করিয়েছেন। ঘরের পাশে বসবাসকারী শিশুদের কুরআনও পড়াতেন। তার স্বামী সিন্ধি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি নওয়াবশাহ্ শহরের আমীরও ছিলেন। এরপর নওয়াবশাহ্‌র জেলা-আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। আজকাল তার পুত্র জেলা আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সন্তান-সন্ততিকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। খুবই ইবাদতগুযার, নির্ভীক, সাহসী, পরম ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ, সরল প্রকৃতির অধিকারীনী, নিবেদিতা এবং বিশ্বস্ত মহিলা ছিলেন। জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল। তার পুত্র লিখেন যে, সকল কাজে খলীফাতুল মসীহ্‌র পথনির্দেশনা অর্জনের চেষ্টা করতেন। দু'বছর পূর্বে তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডায়বেটিসের কারণে পায়ে এমন ক্ষত দেখা দেয় যে, পা কাটার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি অপারেশন করাব না এবং বেশ কয়েকদিন এই অপেক্ষায় ছিলেন। এখানে আমার কাছ থেকে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তিনি পা কাটান নি। অনুমতি পাওয়ার পর তিনি বলেন যে, এখন যা খুশি কর। মহিলা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আতের পর তার দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতার অবস্থা কেমন ছিল দেখুন, তার মা আহমদী ছিলেন। মায়ের ইন্তেকালের পর তার ভাইয়েরা গয়ের আহমদীদের কোন কবরস্থানে তাকে দাফন করে। তার মা যেহেতু ওসীয়ত করেছিলেন তাই ভাইদের চাপ সত্ত্বেও সেখান থেকে লাশ বের করান এবং নিজের মায়ের লাশ রাবওয়া নিয়ে আসেন আর বেহেশতী মকবেরায় সমাহিত করান।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকল বিষয়ে প্রজ্ঞার সাথে কাজ করতেন। কাদিয়ান এবং যুক্তরাজ্যের জলসায় নিয়মিত যোগ দিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) তার সম্পর্কে তার পুত্রকে একবার বলেন, তুমি জান কী যে, তোমার মা আহমদীয়াতের জন্য এক নগ্ন তরবারিতুল্য! ৮৫তে জিয়া অর্ডিন্যান্সের পর যখন কলেমা মুছা হচ্ছিল বা মিটানো হচ্ছিল তখন কলেমার প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ তিনি এভাবে দিয়েছেন যে, জামা'তকে যখন বলা হয়, নিজেদের ঘরে কলেমা লেখ, তখন তিনি সিড়ি লাগিয়ে নিজে ট্যাঙ্কির ওপর চড়ে আপন হাতে কলেমা লিখেন, অথচ একে তো তিনি ছিলেন এক মহিলা আর অপরদিকে এমন পরিবারের সদস্যা ছিলেন যারা সচরাচর এসব বিষয়ে খুবই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে।

তার ছেলে বলেন যে, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তেও অর্থাৎ মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, এ অবস্থায়ও তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদ খাতে এ হলো আমার বাকি চাঁদা, এখনই পরিশোধ করে দাও।

সেখানে আহমদীদের ঘরে ডিশ লাগানোর জন্য একটি স্কীমের সূচনা তিনি এভাবে করেন যে, মহিলাদের সমিতি গড়ে তুলেন। প্রত্যেক মাসে কমিটি বের হতো আর এভাবে কারো না কারো ঘরে ডিশ লেগে যেত এবং খুতবা শুনার ব্যবস্থা হয়ে যেত। তার জামাতা মির্যা আহসান ইমরান, যিনি অস্ট্রেলিয়া জামা'তের কর্মকর্তা, তিনি লিখেন যে, তিনি খুবই নির্ভিক, সাহসী এবং আহমদীয়াতের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন এবং খুতবা শুনতেন। সিন্ধি ভাষা না জানা সত্ত্বেও, বরং উর্দূও সঠিকভাবে জানতেন না, সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার মেয়ে হওয়ার কারণে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করেন এরপর অন্যান্য স্থানে। আর ইংরেজী স্কুলে পড়ালেখা করেন। ইংরেজী ভাষাজ্ঞান তার খুব ভালো ছিল। কিন্তু বিয়ের পর তিনি পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ান এবং সেই পরিবেশে থেকে সিন্ধি ভাষাও শিখে নেন। আর নিজের অআহমদী ও সিন্ধি আত্মীয়দের তবলীগও করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান সন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ ২০১৮, খণ্ডঃ ২৫, সংখ্যাঃ ৮, পৃঃ ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)